# নাম না জানা অতিথি

নাইম আবদুল্লাহ

গ্রামের উত্তর দিকের পরিত্যক্ত বাড়ীটার পাশে একটা লাশ পড়ে আছে। দক্ষিণ পাড়ার শওকত খুব ভোরবেলা মিসওয়াক করতে করতে বাড়ীটার পাশ দিয়ে যাবার সময় লাশটা প্রথম আবিষ্কার করে। তারপর সে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে লোক জড় করে। সেই জনসমাগম এখন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। কেউই লাশটাকে সনাক্ত করতে পারছে না। কিংবা পরবর্তী করণীয় পদক্ষেপ নিয়েও কেউ এগিয়ে আসছে না। গ্রামের চেয়ারম্যান ফজল শেখ এসে জনসমাগম দেখে খুশিতে একটা ছোট খাটো ভাষণ দিয়ে ফেললো।

মিয়ারা তোমরা কেউ কি লোকটাকে চিনো বা কোথাও দেখেছো?

সবাই সমস্বরে বললো, না

তাইলে তো মিয়ারা দেখা যায় বিরাট সমস্যায় পড়া গেল। থানা পুলিশ হবে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তল্লাশি করবে। তারপর তো কোর্ট হাজত পর্যন্ত গড়াবে।

সবশেষে ফজল শেখ চ্যালা চামচা নিয়ে লাশের কোনও বিধি ব্যবস্থা না করেই কেটে পড়লো।

শওকত নিজের গায়ের চাদরটা দিয়ে লাশটা ঢেকে দিলো। থানায় খবর দিতে বললে সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেলো। শওকত নিজে থানায় ছোটাছুটি করে অবশেষে সেকেন্ড অফিসারকে আনতে সক্ষম হলো। তখন প্রায় বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা।

পুলিশ লাশ নিয়ে পোস্টমর্টেমের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দিলো। তারপর শওকত বাদী হয়ে থানায় একটা সাধারণ জিডি এন্ট্রি করলো।

শওকত গ্রামের ইন্টার ফেল একজন বেকার যুবক। গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করা ছাড়া তার আর সুনির্দিষ্ট কোনও কাজ নেই। বিধবা মা শিকদার বাড়িতে সারা মাস কাজ করে যা পায় তা দিয়ে দুজনের সংসার কোনভাবে চলে যায়।

সে গ্রামের দোকানে দোকানে চাঁদা তুলে আশে পাশের গ্রামে মাইকিং করে লাশের পরিচয় জানার চেষ্টা করে। পোস্টমর্টেম শেষে কোনও দাবীদার না থাকায় লাশ শওকতের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। সে আবারও বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাফনের কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কেনার টাকা জোগাড় করে। পরিশেষে গ্রামের গোরস্থানে লাশের দাফন করে। কবরের সামনে একটা সাইন বোর্ডে লেখা থাকে “নাম না জানা অতিথি”।

শওকত সব সময় ভাবে এই বুঝি কেউ লাশের খোঁজে গ্রামে ছুটে আসবে। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরে মাস পেরিয়ে গেলেও কেউ কোনও খোঁজ খবর করে না। সে তার প্রিয় ছাগলটা বিক্রি করে সেই টাকায় ঢাকার দুইটি  দৈনিক পত্রিকায় লাশের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়। তারপরও কেউ যোগাযোগ করে না।

প্রায় বছর দশেক পরে এক সকালে একটি অপরিচিতা মেয়ে তার দোকানের সামনে এসে দাড়ায়। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর হাতে একটি পত্রিকা ভাজ করা। বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে

আপনি শওকত?

শওকত দোকান থেকে বেড়িয়ে এসে বলে

হ্যাঁ আমার নাম শওকত। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি ঢাকা থেকে এসেছি। এই বলে শওকতের সামনে দশ বছর আগের একটি পত্রিকা মেলে ধরে। সে বিজ্ঞাপনটি দেখে চিনতে পারে। তারপর তড়িঘড়ি করে ঝাপ নামিয়ে দোকান বন্ধ করে মেয়েটিকে বললো

আসেন আমার সঙ্গে

মেয়েটি দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকে

তারা কবরের উপরের কৃষ্ণচূড়া গাছটির পাশে গিয়ে দাড়ায়। কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলে পুরো কবরটি ঢেকে আছে। মেয়েটি কবরটি দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শওকত বোকার মতো দাড়িয়ে থাকে। তার কাছে মনে হয় হঠাৎ সময় যেন থেমে গেছে।

একসময় মেয়েটি নিজেকে সামলে নেয়ে উঠে দাড়িয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে বললো

আমার নাম জেবিন। আমি বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ওনার নাম হাসান শাহরিয়ার। পেশায় একজন সাইন্টিস্ট। জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নের অধ্যাপক।

আমি আপনাদের গ্রামে কয়েকটা দিন থাকতে এসেছি। এখানে কি কোনও হোটেল বা রেস্ট হাউস আছে?

শওকত বিনীত ভঙ্গিতে বলে এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকার তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। তারপর কিছুটা লজ্জিত গলায় বলে

আপনার কোনও অসুবিধা না হলে আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন।

তারপর সে জেবিনের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তার ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বাড়ীর পথে রওনা দেয়। শওকতের মা জেবিনের পরিচয় জানতে পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে ওরা উঠানে এসে বসে। জেবিন বলতে শুরু করে

বাবা একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপান থেকে ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে উঠেছিলো। পরদিন দুপুরে একটি পাঁচ তারা হোটেলে তার সদ্য আবিষ্কৃত একটি ফর্মুলার প্রেজেন্টেশন ছিল। রাতে শেষ আমাদের সাথে কথা হয়েছিল। ঐদিন সকাল থেকে বাবার আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি আর মা জাপান থেকে অনেক চেষ্টা করেও বাবার আর কোনও সন্ধান পাইনি। কেন বাবাকে মরতে হোল আর এর পেছনে দায়ী কারা তাও আমরা জানতে পারিনি। বাবার শোক সইতে না পেরে এই বছরের প্রথম দিকে আমার মাও মারা যায়। মা বেঁচে থাকতে আমি বাবার খোঁজে অনেকবার বাংলাদেশে আসতে চেয়েছি কিন্তু মা আমাকেও হারানোর ভয়ে রাজী হয়নি। ঢাকায় এসে পত্রিকা অফিস থেকে ওই সময়কার পুরানো পত্রিকা ঘেঁটে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপনটা আবিষ্কার করি।

আর একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি। আমার মা জাপানের মেয়ে। বাবা জাপানে পিএইচডি করার সময়  ভালবেসে মাকে বিয়ে করে। এতটুকু বলার পর সে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শওকতের মা পরম মমতায় জেবিনের মাথায় হাত রাখে।

তারপরের কয়েকটা দিন খুব দ্রুত কেটে যায়। প্রতিদিন জেবিন বেশ কিছু সময়ের জন্য তার বাবার কবরের পাশে নীরবে বসে থাকে। মাঝে মাঝে সে পরম যতনে কবরের মাটিতে হাত বুলায়।

অবশেষে জেবিনের জাপান ফেরার সময় হয়ে আসে। সে শওকতকে জাপানে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে মা ছেলে দুজনেই শ্রদ্ধা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে।

শওকত ও তার মা জেবিনকে বড় রাস্তার মোড়ে বাসে তুলে দিতে আসে। বাসে ওঠার আগে তার মা জেবিনের মাথায় হাত রেখে দোয়া করে। বাসের দরজার পাদানিতে পা রেখে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে সে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠে

আমি আবার ফিরে আসবো মা আমার কথা মনে রেখো। বাস দ্রুতগতিতে বিন্দু থেকে বিন্দুতে মিলিয়ে যায়।